بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ মে ২০২৩ মোতাবেক ০৫ হিজরত ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (সূরা নাহল: ৯১)

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের এবং অনাত্মীয়দেরও নিকটাত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করেন আর সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও অপন্দনীয় বিষয় আর বিদ্রোহ থেকে বারণ করেন। তিনি তোমাদের নসীহত করেন যেন তোমরা বুঝতে পারো।

এই আয়াতটি প্রত্যেক জুমুআ ও দুই ঈদের সানী খুতবায়ও পাঠ করা হয়। এতে কিছু নেকী বা পুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর (কিছু) মন্দ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'লা বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে নিজ ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নির্দেশ ও নসীহতসমূহ মেনে চলে, নতুবা সেই মর্যাদা লাভ হয় না যা এক মুসলিমকে প্রকৃত মু'মিন বানায়। এই আয়াতে যেসব নেকী বা পুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ এবং আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করা– সেগুলো সম্পর্কে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করব যা তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সভায় বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি নির্দেশনা যদিও একই কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু বিভিন্নভাবে নসীহত করা হয়েছে যেগুলো আমাদেরকে আমাদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী অতিবাহিত করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তিনি শুধু মানুষের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই এসব বৈশিষ্ট্য ও পুণ্যের কথা বলেন নি, বরং ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহারের সম্পর্ক খোদা তা'লার সাথেও বজায় রাখা যায় তা-ও বলেছেন। তিনি এর এমন তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করেছেন যার দ্বারা প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে অন্তদৃষ্টি লাভ হয়, যা এক মু'মিনকে ঈমান ও বিশ্বাসের নতুন সব গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। যাহোক এখন আমি কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, এগুলো সম্পর্কে মানুষ যদি প্রণিধান করে আর (এগুলোকে) নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা এমন এক কর্মপন্থা লাভ করি যা বাস্তব অর্থে আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করে আর একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এভাবে এমন এক চমৎকার সমাজও প্রতিষ্ঠা করে যা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানকারী সমাজ হয়ে থাকে। আর এটিই সেই জিনিস যা সমাজেরও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং জগতের নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা প্রদানকারী। কিন্তু পরিতাপ যে, জগতের অধিকাংশ লোক একে অপরের অধিকার

হরণের চেষ্টায় রত, তা মুসলিম বিশ্ব হোক বা অমুসলিম বিশ্ব। মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নামে অন্যায় ও অত্যাচারে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের জন্য আবশ্যক এবং তাদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদেরও সংশোধন করা এবং জগদ্বাসীরও সংশোধনের চেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমাদের জন্য খোদার নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর সাথে এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার প্রদান করো। আর যদি এরও অধিক সম্ভব হয় তাহলে শুধু ন্যায়বিচারই নয়, বরং অনুগ্রহ করো। অর্থাৎ ফরয বা অবশ্য পালনীয় দায়িত্বাবলীর চেয়ে অধিক করো, আর এমন নিষ্ঠার সাথে খোদার ইবাদত করো যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। (প্রথমে বান্দার অধিকার সম্পর্কে বলেন, এরপর বলেন যে, খোদার ইবাদতও এমনভাবে করো যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো।) আর মানুষের সাথে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে অধিক দয়ার্দ্র আচরণ করো। আর যদি এর চেয়েও অধিক সম্ভব হয় তাহলে এতটা নিঃস্বার্থ হয়ে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে গিয়ে) কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই খোদার ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করো। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতও নিঃস্বার্থভাবে করো, কোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র সামনে যাবে না। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবাও নিঃস্বার্থভাবে করো যেমনটি কেউ আত্মীয়তার প্রেরণায় করে থাকে।)

এরপর উক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি (আ.) আরও বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বান্দাদের অধিকার কীভাবে প্রদান করতে হবে তা-ও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

প্রথমত এই আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখো, অন্যায়কারী হয়ো না। সর্বদা এর প্রতি দৃষ্টি রাখো, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করো। অতএব যেভাবে প্রকৃত অর্থেই তিনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, কেউই ভালোবাসা লাভের যোগ্য নয়, কেউই ভরসার যোগ্য নয়; কেননা সৃষ্টি করা, চিরস্থায়ী হওয়া ও স্থায়িত্বদান এবং প্রতিপালনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সকল প্রকারের অধিকার তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ন্যায়বিচার করার অর্থ কী? (এর অর্থ হলো) আল্লাহ্ তা'লার সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আর আনুগত্যের সম্পর্ক এজন্য রাখতে হবে কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি চিরস্থায়ী এবং তিনিই স্থায়িত্ব দানকারী। প্রতিপালনের ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি প্রতিপালক, প্রতিপালনকারী। আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণকারী। তাই ভরসাস্থল ও ভালোবাসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। অনুরূপভাবে তোমরাও তাঁর ইবাদতে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এবং তাঁর প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যে তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার কোরো না। যদি তোমরা এতটুকু করো তবে এটিই হলো ন্যায়বিচার যার প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে আদল বা ন্যায়বিচার করা। এতটুকু করা আবশ্যক। এরপর যদি এক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাও, পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চাও, তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে এহসান । আর তা হলো, তোমরা তাঁর মাহাত্ম্যে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং ইবাদতে তাঁর সামনে এমনভাবে সশ্রদ্ধ হও এবং তাঁর ভালোবাসায় এরূপ বিভোর হয়ে যাও যেন তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ এবং তাঁর

অম্লান সৌন্দর্য অবলোকন করেছো। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে, অনুগ্রহ করা; আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তো অনুগ্রহ করা যায় না, কিন্তু এখানে এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ নিমগ্নচিত্ত হয়ে যাও যেন তুমি তাঁর মাহাত্ম্যকেও অবলোকন করেছো, তাঁর প্রতাপকেও অবলোকন করেছো এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছো, তাঁর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছো। অতঃপর বলেন, এরপর রয়েছে নিকটাত্মীয়সুলভ ব্যবহারের পর্যায়, আর তোমার ইবাদত, তোমার ভালোবাসা এবং তোমার আনুগত্য থেকে যেন লোকদেখানো ও কৃত্রিমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় হতে পারে, অনুগ্রহস্বরূপ তুমি যা করছো অর্থাৎ যে চেষ্টা করছো তাতে কিছুটা কৃত্রিমতা থাকতে পারে; কিছুটা কৃত্রিমতা করতে হয় বা চেষ্টা করতে হয়; কিন্তু এমন অবস্থায় উন্নীত হও যেন কৃত্রিমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। এক আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তুমি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী হও এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনকারী বান্দায় পরিণত হয়ে যাও এবং তুমি তাঁকে সেরূপ আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করো যেভাবে উদাহরণস্বরূপ তোমরা তোমাদের পিতাদের স্মরণ করে থাকো, এবং তাঁর প্রতি তোমাদের ভালোবাসা যেন এরূপ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেরূপ এক শিশু তার প্রিয় মাকে ভালোবাসে।

এরপর বলেন, দ্বিতীয়ত বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রে যে সহমর্মিতা মানবজাতির প্রতি প্রদর্শন করতে হবে সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের অর্থ হলো, নিজ ভাই ও মানবজাতির প্রতি ন্যায়বিচার করো এবং নিজ প্রাপ্য থেকে অধিক আদায় করার চেষ্টা কোরো না এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো। যতটুকু তোমার অধিকার রয়েছে তা অবশ্যই তাদের কাছে চাও, কিন্তু ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। অন্যায্য দাবি-দাওয়া যেন না করা হয়। আর যদি এ পর্যায় থেকে উন্নতি করতে চাও তাহলে এর পরে রয়েছে এহসান বা অনুগ্রহের স্তর আর তা হলো, তুমি নিজের ভাইয়ের মন্দের বিপরীতে পুণ্য করবে। যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ (আচরণ) করে তাহলে তার সাথে সদ্ব্যবহার করো, এটিই হলো এহসান। আর তার (দেয়া) কষ্টের বিনিময়ে তাকে আরাম দাও। যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয় তাহলে তুমি তার আরামের ব্যবস্থা করো, তাকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো এবং দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ তার হাতে হাত দাও। এরপরের ধাপ হলো ঈতায়ি যিল-কুরবা'র আর তা হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি যতটুকু পুণ্য করবে অথবা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে সেক্ষেত্রে যেন কোনো প্রকার অনুগ্রহ লাভ করা উদ্দেশ্য না হয়। এর অর্থ কোনোরূপ অনুগ্রহ যেন না হয়, বরং কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না করে স্বভাবজাতভাবেই যেন তা তোমার দ্বারা সম্পাদিত হয়। (এমন কাজ করো যা স্বভাবজভাবে হয়ে থাকে)। যেভাবে নৈকট্যের টানে উদ্বেলিত হয়ে এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। (এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাথে, এক আপনজন অন্য আপনজনের সাথে পুণ্য করে থাকে। কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করবে)। অতএব এটি নৈতিক উন্নতির চূড়ান্ত স্তর, যেখানে সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রবৃত্তির চাহিদা, স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকে না, বরং ভ্রাতৃত্ব ও মানবপ্রেমের প্রেরণা এরূপ উন্নত স্তরে এসে উপনীত হয় যেখানে আপনা-আপনি, সবরকম কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে থেকে এবং কোনো প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে, কোনোরূপ কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করে (অর্থাৎ, কোনো প্রত্যাশা না রেখে, কোনো ধরনের কৃতজ্ঞতার আশা না করে কিংবা দোয়া অথবা অন্য কোনো

প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রেখে) সেই পুণ্য যেন কেবলমাত্র স্বভাবজাত উদ্দীপনায় সম্পাদিত হয়। (কেউ তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, অথবা তোমার জন্য দোয়া করবে অথবা কারো কাছে অন্য কোনো পুণ্যের বাসনা থাকবে– এমনটি হওয়া উচিত নয়। কোনো ধরনের প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে তার সাথে নৈকট্যের সম্পর্কের কারণে এই কাজ করা উচিত)। অতএব এটি সেই আচরণ যা সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে করা উচিত। এরপর এর গণ্ডি আরো বিস্তৃত করে অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছানো উচিত। এরপর হুকূকুল্লাহ্‌র বরাতে তিনি (আ.) আরো বলেন,

হাক্কুল্লাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের অর্থ হলো, ন্যায়পরায়ণতার সাথে খোদা তা'লার আনুগত্য করো। কেননা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে লালনপালন করেছেন এবং প্রতিনিয়ত করছেন; তাঁর প্রাপ্য অধিকার হলো, তুমিও তাঁর আনুগত্য করবে। (আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালনপালন করেছেন, প্রতিপালন করছেন, জাগতিক উপকরণাদি সরবরাহ করছেন, তুমি তাঁর আনুগত্য করবে– এটি তাঁর অধিকার; তাই তাঁর আনুগত্য করো।) আর যদি তোমার অন্তর্দৃষ্টি এর চেয়েও প্রখর হয় তাহলে কেবলমাত্র অধিকার প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং এহসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করো। প্রথম পর্যায় হলো আদল বা ন্যায়বিচার, অর্থাৎ মনে রাখবে যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করছেন (তাই) আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। বরং এর চেয়েও অগ্রগামী হয়ে এহসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করো কেননা তিনি মুহসিন বা এহসানকারী, আর তাঁর অনুগ্রহ এত বেশি যে, গণনা করে শেষ করা যায় না। (আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করা আরম্ভ করো, এরপর তাঁর আনুগত্য করো। অতএব এটি হলো এহসান বা অনুগ্রহের মান বা মর্যাদা। আর এটি জানা কথা যে, আদলের স্তর থেকে উন্নত স্তর সেটি, যেখানে আনুগত্যের সময় এহসানও যেন দৃষ্টিপটে থাকে। আর যেহেতু সবসময় অনুগ্রাহীর বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ তার চেহারাকে সামনে নিয়ে আসে, তাই এহসানের সংজ্ঞায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত যে, সে এমনভাবে ইবাদত করে যেন খোদা তা'লাকে চাক্ষুস দেখছে।

কাজেই, এটি হলো খোদার প্রতি এহসান এর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'লার প্রতি তো (কেউ) এহসান করতে পারে না, (বরং মানুষের প্রতি) আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ করা মানুষকে এহসানকারী বানায়। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করার জন্য যে রীতি তিনি (আ.) বলেছেন তা হলো, তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করে তার চেহারা ও তার বৈশিষ্ট্য তোমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর তা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন তোমার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'লার সাথে যখন এই সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করবে, আর সেই ইবাদত এমন হবে, তোমাদের মন-মস্তিষ্কে এমন ভাবনার উদয় হবে যে, তোমরা যেন খোদা তা'লাকে দেখছো।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারীরা মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ তারা যারা পর্দাচ্ছন্ন থাকায় এবং উপকরণের ওপর নির্ভরতার কারণে খোদা তা'লার অনুগ্রহকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করে না। (তাদের অন্তরে পর্দা রয়েছে অথবা উপকরণের ওপর অত্যধিক নির্ভর করার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারে না, বুঝতে পারে না। যেহেতু জানে না তাই অনুরাগও সৃষ্টি

হয় না, যা অনুগ্রহের মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টিপাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।) তাদের মাঝে সেই ভালোবাসা উদ্বেলিত হয় না যা অনুগ্রাহীর মহান বদান্যতার কথা চিন্তা করে উদ্বেলিত হয়ে থাকে। [আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে যতক্ষণ সঠিক ধারণাই সৃষ্টি না হবে এবং তাঁর অবয়বই দৃষ্টির সামনে ভেসে না উঠবে, তাঁর অনুগ্রহের কথাই মাথায় না আসবে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত (বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য) সম্পর্কে মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করলে সেই উদ্দীপনাও সৃষ্টি হতে পারে না।] তিনি (আ.) বলেন, অর্থাৎ হৃদয়ের সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে না যা একজন অনুগ্রহকারীর কৃপারাজিকে কল্পনা বা স্মরণ করে হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে, বরং শুধুমাত্র ভাসাভাসা দৃষ্টিতে খোদা তা'লার স্রষ্টা হওয়া ইত্যাদি বিষয় স্বীকার করে নেয়। (এমন লোকেরা সামগ্রিকভাবে, এক প্রকার ভাসাভাসা দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকর্তা হবার বিষয়টি মেনে নেয় যে, হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'লা হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু এর গভীরতার জ্ঞান তারা রাখে না।) আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বিশদ দিকগুলো, যেগুলির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত সেই সত্যিকার অনুগ্রাহীকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে, তা (তারা) কখনোই প্রত্যক্ষ করে না। গভীরভারে এটি পর্যালোচনা করে না যে, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ তা'লার যে অধিকার রয়েছে তা আমাদের কাছে কী দাবি করে। গভীরভাবে এটি অধ্যয়ন করে না, কেননা উপকরণপূজার ধুলোবালি সব কারণের মূল কারণ তথা খোদার চেহারা দর্শনের ক্ষেত্রে বাধ সাধে। (জাগতিক উপকরণাদির ধুলোময়লা, এর ধুলোবালি তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, যে কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার চেহারা দেখতে পায় না।) এ কারণে তাদের সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় না যা দিয়ে পূর্ণরূপে প্রকৃত দানকারীর সৌন্দর্যকে (তারা) পরিপূর্ণরূপে দর্শন করতে পারে। (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত দাতা তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সৌভাগ্য তাদের হয় না; এরূপ দৃষ্টিশক্তি তাদের নেই।) তাদের দুর্বল তত্ত্বজ্ঞান, উপকরণের ওপর নির্ভরশীলতার কলুষের সাথে একাকার হয়ে বিরাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে তাদের যতটুকু তত্ত্বজ্ঞান আছে, যৎসামান্য যে জ্ঞান আছে, সে কারণে তারা কখনো নামায পড়ে আবার কখনো নামায পড়ে না। কখনো অধিকার প্রদান করে আবার কখনো করে না; এর সাথে উপকরণের কলুষতার মিশ্রণ থাকে। জাগতিক বস্তুসমূহ, পার্থিব উপকরণ ও জাগতিক কামনা-বাসনা অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার চেহারা যথার্থরূপে দেখতে পারে না। আর এছাড়া তারা নিজেরাও যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি সঠিকভাবে দেখতে পায় না তাই এর প্রতি তারা মনোযোগী হয় না, যা অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করার সময়ে করতে হয়। সে দিকে তাদের পুরো মনোযোগ নেই যার ফলে অনুগ্রাহীর চেহারা সামনে এসে যায়, বরং তাদের অন্তর্দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে থাকে, বরং সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'লার চেহারা স্পষ্টরূপে দেখতেই পায় না। কারণ হলো, তারা কিছুটা নিজেদের পরিশ্রম ও উপকরণের ওপর ভরসা করে আর কিছুটা কৃত্রিমভাবে এ-ও বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হবার কারণে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান আমাদের জন্য অপরিহার্য। তারা স্পষ্টভাবে জানেই না। তাদের কিছুটা ভরসা থাকে যে, আমরা এ কাজ করেছি এবং আমাদের এই জ্ঞান ছিল তাই আমাদের এ কাজটা হয়ে গেছে; (এর প্রতি ভরসা থাকে)। এছাড়া ধর্মীয় পরিবেশে থাকার কারণে তাদের ওপর ধর্মেরও কিছু না কিছু প্রভাব পড়ে থাকে তাই স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার যে অধিকার রয়েছে– আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, আমাদের প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা-ও মাথায় থাকে। মোটকথা (একপ্রকার) মিশ্র অবস্থা তাদের (মস্তিষ্কে)

বিরাজ করে। এই মিশ্র অবস্থায় সে সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার চেহারা দেখতে পায় না এবং খোদা তা'লা যেহেতু মানুষের ওপর তার বোধবুদ্ধির বাইরে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না, তাই যতদিন তারা এ অবস্থায় থাকে তাদের কাছে ন্যূনতম এটিই প্রত্যাশা করেন যে, (তারা যেন) তাঁর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ – এই আয়াতে আদল দ্বারা মানুষের ন্যায়সঙ্গত আনুগত্যকে বুঝায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত কার্যকর হয়। এমন লোক যারা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার চেহারা দেখতে পায় না, তাদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা দয়ার আচরণ করেন এবং তাদের সেই (দুর্বল অবস্থাকেও) গ্রহণ করেন। [এটি তো ন্যায়পরায়ণতা, এটি মৌলিক বিষয়; এক মুসলমানের সর্বনিম্ন মান।] তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু মানুষের এর চেয়ে উন্নত মা'রেফাত (তথা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ) হলো, আমি যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করেছি, মানুষের দৃষ্টি উপায়-উপকরণের (কলুষতা) থেকে একেবারেই পবিত্র এবং পরিষ্কার হয়ে খোদা তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহের হাত দেখতে পায়। কেবল এই জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর আস্থা রাখে না, বরং মানুষ যখন উন্নতি করে পরের স্তরে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে দেখতে পায়। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার ওপর আস্থা সৃষ্টি হয়, তাঁর পরিচয় লাভ হয়। এই স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষ উপায়-উপকরণের (কলুষিত) আবরণ থেকে একেবারেই বাইরে বেরিয়ে আসে। [জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে না বরং পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা রাখে।] আর 'আমার পানি সিঞ্চনেই আমার ফসল হয়েছে' অথবা 'আমার বাহুবলে আমি সফলতা লাভ করেছি', অথবা 'যায়েদের অনুগ্রহে অমুক উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে' আর 'বকরের দেখভালের ফলে আমি ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছি'– এসব উক্তি বা কথা তুচ্ছ এবং মিথ্যা প্রতিভাত হতে থাকে। নিজের কোনো গুণ বা চেষ্টার ওপর নির্ভরতা থাকে না, আর অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতা এবং গুণের ওপর নির্ভরতাও থাকে না। এ সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায় আর একটিমাত্র সত্তা, একজন সর্বশক্তিমান ও একজন অনুগ্রহকারী বরং একটি হাতই দৃষ্টিগোচর হয়। তখন মানুষ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি দেখতে পায় যার সাথে এক অণু পরিমাণও উপকরণরূপী শিরকের নোংরামি থাকে না। [আল্লাহ্ তা'লা যখন এভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহকে মানুষ দেখতে পায়।] আর সেই দর্শন এমন স্বচ্ছ এবং সুনিশ্চিত হয় যে, সে এমন অনুগ্রহকারীর ইবাদত করার সময় তাঁকে অদৃশ্য মনে করে না, বরং অবশ্যই তাঁকে উপস্থিত মনে করে তাঁর ইবাদত করে। [এরপর মানুষ যখন ইবাদত করে বা নামায পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের সামনে উপস্থিত মনে করে।] আর পবিত্র কুরআনে এই ইবাদতের নাম রাখা হয়েছে এহসান [অর্থাৎ যেন খোদার প্রতি অনুগ্রহ। [আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে এমনভাবে সিজদাবনত হওয়া যেন আল্লাহ্ সামনেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন এটিকে এহসান বলে]। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে স্বয়ং মহানবী (সা.) এহসানের এই অর্থই করেছেন।

[এখানেই কথা শেষ হয়ে যায় নি, বরং তিনি (আ.) আরো বলেন,] এই স্তরে উন্নীত হওয়ার পর আরেকটি স্তর রয়েছে যার নাম **'ঈতায়ি যিল-কুরবা'** আর এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যখন একটা সময় পর্যন্ত ঐশী অনুগ্রহরাজীকে সকল প্রকার উপায়-উপকরণরূপী শিরক হতে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, [যেমন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ জাগতিক কোনো উপায়-উপকরণে কলুষিত না করে দেখতে থাকে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রতি শতভাগ আস্থা রাখে এবং তাঁকে উপস্থিত এবং প্রত্যক্ষ অনুগ্রহকারী জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত করতে

থাকে তখন এই প্রত্যয় ও চিন্তাধারার চূড়ান্ত ফলাফল যা প্রকাশ পাবে তা হলো, আল্লাহ্‌র সাথে তার এক ব্যক্তিগত ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। [আল্লাহ্‌র সাথে তার এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হবে] যার মাঝে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে না। কোনো জিনিস নিজ ব্যক্তিগত চাহিদার কারণে যাচনা করবে না। বরং একপ্রকার ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, কেননা খোদার অব্যাহত অনুগ্রহরাজী স্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ করা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে এই প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সেই ব্যক্তির ভালোবাসা ধীরে ধীরে তার মাঝে সৃষ্টি হয়। [যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছে এবং ক্রমাগত অনুগ্রহের উপলব্ধি ও তা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ এটি দেখতে থাকা যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে অনুগ্রহ করছেন– সেই (অনুগ্রহের) উপলব্ধি ও জ্ঞান যখন তার লাভ হয়, তখন কী হয়? এর ফলে তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যক্তিগত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা এটি চিরন্তন রীতি, যদি এ ধরনের সম্পর্ক থাকে তাহলে তার প্রতি এক ব্যক্তিগত ভালোবাসায় মন ভরে যায়;] যার অফুরন্ত অনুগ্রহরাজি তাকে ঘিরে রেখেছে। এমতাবস্থায় সে কেবল তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসা তার হৃদয়ে বাসা বাঁধে। [প্রথমে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ইবাদত, এরপর আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছু জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত– এটি হলো এহসানের রঙে রঙিন ও উপলব্ধি করে (ইবাদত); এরপর এর থেকেও উন্নতর স্তর রয়েছে যেখানে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ইবাদত করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে সে স্মরণ করে, সেটির কারণে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে।] ঠিক যেমন মায়ের প্রতি সন্তানের এক ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে থাকে। সুতরাং এই স্তরে পৌঁছে সে ইবাদত করার সময় কেবল খোদা তা'লাকে দেখেই না, বরং দেখে নিবেদিত প্রেমিকদের মতো (ভালোবাসার) পুলকও বোধ করে এবং প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা তিরোহিত হয়ে তার মাঝে ব্যক্তিগত এক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটি সেই স্তর যা খোদা তা'লা **ঈতায়ি যিল-কুরবা** (আত্মীয়সুলভ বদান্যতা) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। আর এটির প্রতিই খোদা তা'লা فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا –এই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে তোমরা সেভাবে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহদের স্মরণ করে থাকো, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করো। (সূরা বাকারা: ২০১)। সুতরাং এটি হলো সেই মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ ভালোবাসা সৃষ্টি হবার স্তর।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা এটি হলো إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ আয়াতের তফসীর এবং এতে খোদা তা'লা মানবীয় তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি স্তরই বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় স্তরকে ব্যক্তিগত ভালোবাসার স্তর আখ্যা দিয়েছেন। এটি হলো সেই স্তর যেখানে যাবতীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং হৃদয় সেভাবে ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায় যেমনটি এক শিশি আতরে পূর্ণ হয়ে থাকে; [অর্থাৎ আতরের শিশি যেমন হয়ে থাকে।] এই স্তরের প্রতিই وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে কতিপয় এমনও হয়ে থাকে যারা নিজেদের প্রাণ খোদার সন্তুষ্টির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় এবং খোদা এমন ব্যক্তিদের প্রতি অতি সদয়। (সূরা বাকারা: ২০৮)। এবং আরো বলেছেন– بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ

مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ সেসব মানুষ মুক্তিপ্রাপ্ত যারা খোদার কাছে নিজেদের সত্তা সমর্পণ করে দেয় এবং তাঁর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করে এমনভাবে ইবাদত করে যেন তারা তাঁকে (চাক্ষুস) দেখতে পাচ্ছে; সুতরাং এমন ব্যক্তিরা খোদার কাছ থেকে প্রতিদান পেয়ে থাকে, এবং তাদের কোনো ভয়ও নেই আর তারা দুঃখিতও হয় না। (সূরা বাকারা: ১১৩)। অর্থাৎ খোদা ও খোদার ভালোবাসাই তাদের অভিষ্ট হয়ে যায় এবং খোদার নেয়ামতসমূহ তাদের প্রতিদান হয়ে থাকে। আবার আরেক স্থানে বলেছেন, وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا অর্থাৎ মু'মিন হলো তারা, যারা খোদার ভালোবাসায় মিসকীন (বা দুস্থ,) এতীম ও বন্দিদের খাবার খাইয়ে থাকে এবং বলে, এই খাবার খাওয়ানোর জন্য আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না বা (এতে) আমাদের অন্য কোনো স্বার্থ নেই। এই সকল সেবার পেছনে কেবলমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। (সূরা দাহর: ৯-১০)। [এই যাবতীয় সেবার উদ্দেশ্য হলো আমাদের প্রতি খোদার সন্তুষ্টি, আল্লাহ্ তা'লাকে আরো ভালোভাবে দেখতে পাওয়া।]

এখন চিন্তা করা উচিত, এই সবগুলো আয়াত থেকে কত স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, পবিত্র কুরআন খোদার ইবাদত ও পুণ্যকর্মের সর্বোচ্চ ধাপ এটি নির্ধারণ করেছে যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা যেন স্বচ্ছ ও সত্য অন্তকরণে হয়। [এবং আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি ভালোবাসা লাভ করার জন্য তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতিও ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, যেমনটি এসব আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রাপ্য একজন মু'মিন বান্দা, খোদা তা'লার প্রেমিক যথার্থভাবে আদায় করতে পারে এবং করে।]

অতঃপর কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন? এটিই যে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সাথে ন্যায়বিচার করো। এর চেয়েও উন্নত পুণ্য হলো, তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো যারা তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে নি। আরো উৎকৃষ্ট পুণ্য হলো, তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূলের সাথে এমন সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করো যেন তোমরা তাদের সত্যিকার আত্মীয়, যেভাবে মা তার সন্তানদের সাথে করে। কেননা এহসান (তথা অনুগ্রহের) মাঝে এক প্রকার আত্মপ্রচারের উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে, আর অনুগ্রহকারী কখনও কখনও অনুগ্রহের খোঁটাও দিয়ে বসে। কিন্তু যে ব্যক্তি মায়ের ন্যায় সহজাত প্রেরণায় পুণ্য করে, সে কখনো আত্মপ্রচার করতে পারে না। অতএব নেকী তথা পুণ্যের সর্বশেষ স্তর হলো মায়ের মতো সহজাত প্রেরণা। আর এই আয়াতটি কেবল সৃষ্টিকূলের জন্যই নয় বরং খোদা তা'লার জন্যও। খোদা তা'লার সাথে আদল তথা ন্যায়বিচার হলো, তাঁর অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণপূর্বক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা আর খোদা তা'লার সাথে এহসান হলো, তাঁর অস্তিত্বে এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেন সে তাঁকে সাক্ষাৎ দেখছে আর খোদা তা'লার সাথে ঈতাই যিল-কুরবা হলো, কোনো বেহেশতের আশা কিংবা দোযখের ভয়ে তাঁর ইবাদত না করা; বরং যদি মনে করা হয় যে, বেহেশত-দোযখ বলে কোনো কিছু নেই তদুপরি ঐশীপ্রেমের উচ্ছ্বাস এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য যেন দেখা না দেয়।

খোদা তা'লার সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা সংক্রান্ত যে বিস্তারিত বিবরণ কিশতিয়ে নূহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ের মোদ্দা কথা হলো এটি।

অতঃপর তিনি (আ.) হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আরো বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আদেশ প্রদান করেন, তোমরা আদল তথা ন্যায়বিচার করো; এর চেয়ে উন্নত স্তর হলো ন্যায়বিচারের বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখে এহসানও (অনুগ্রহ) করো। আর অনুগ্রহের চেয়ে উন্নতি করে তোমরা মানুষের সাথে এমনভাবে সদ্ব্যবহার করো যেন তারা তোমাদের অতিপ্রিয়জন এবং নিকটাত্মীয়। এখন ভেবে দেখা উচিত, (সদ্ব্যবহারের) স্তর ৩টি। প্রথমতঃ মানুষ আদল তথা সুবিচার করে অর্থাৎ অধিকারের বিপরীতে অধিকার দাবি করে। এর চেয়ে উন্নতি সাধন করলে এহসানের স্তরে উপনীত হয়। যদি এর চেয়ে উন্নতি সাধন করে তাহলে এহসানের মার্গকেও উপেক্ষা করে আর এমন প্রেমে মানুষের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করে যেভাবে মা তার সন্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, অর্থাৎ এক প্রকার স্বভাবজাত স্পৃহায় এমনটি করে; কোনো এহসান বা অনুগ্রহের মনমানসিকতা নিয়ে নয়। এটি হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের সারসংক্ষেপ।

তিনি (আ.) প্রথমে সাধারণ মানুষ ও বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। অতঃপর জামা'তকেও তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

খোদার সৃষ্টিকূলের সাথে এমনভাবে সদ্ব্যবহার করো যেন তোমরা তাদের সত্যিকারের আত্মীয়। এ স্তরটি সবার ওপরে, কেননা এহসানে (অনুগ্রহ) আত্মপ্রচারের একটি উপাদান নিহিত থাকে। কেউ যদি অনুগ্রহ অস্বীকার করে তবে অনুগ্রহকারী অমনি তাকে বলে বসে যে, আমি তোমার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছিলাম! অথচ সহজাত ভালোবাসা যা এক মায়ের তার সন্তানের সাথে হয়ে থাকে তাতে কোনো প্রকার লোকদেখানো ভাব থাকে না। যদি কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহ করেও তবে কোনো এক সময় খোঁটাও দিয়ে ফেলে। কিন্তু মা তার সন্তানকে কখনো খোঁটা দেয় না। এমনকি যদি একজন রাজা কোনো মাকে এ আদেশ দেয় যে, তুমি তোমার সন্তানকে মেরে ফেললেও তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সে কখনো এ-কথা শোনা পছন্দ করবে না এবং সেই বাদশাহকে গালি দিবে। অথচ সে জানে যে, (সন্তান) যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত আমি মারা যাবো, কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারণে সে সন্তানের প্রতিপালন করা থেকে বিরত হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা বার্ধক্যে থাকে আর তাদের সন্তানসন্ততিও থাকে, কিন্তু বাহ্যত সন্তানদের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার তাদের কোনো আশা থাকে না। কিন্তু তবুও তারা তাদের ভালোবাসে এবং লালনপালন করে। এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়। যে ভালোবাসা এই স্তরে উপনীত হয় তার প্রতি ঈতায়ি যিল-কুরবাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে এ ধরনের ভালোবাসা হওয়া উচিত যেখানে না থাকবে মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা আর না অপমানের ভয়।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আদল বা ন্যায়বিচারের সর্বনিম্ন স্তর হলো যতটা নেবে ততটা দেবে। ন্যায়পরায়ণতা হলো যতটুকু নেবে ততটুকুই দেবে। অর্থাৎ এটিই হলো ন্যায়বিচারের ন্যূনতম মান। এর চেয়ে উন্নতি করলে রয়েছে এহসান বা অনুগ্রহের স্তর। যতটা নেবে ততটা তো দেবেই বরং এর চেয়ে বাড়িয়ে দেবে; এটি এহসান বা অনুগ্রহ। অর্থাৎ যতটুকু নিয়েছো ততটুকুই ফিরিয়ে দাও এবং তার চেয়েও বাড়িয়ে দাও। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে ঈতায়ি যিল-কুরবার স্তর। অর্থাৎ অন্যদের সাথে সেভাবে সদাচার করা যেভাবে একজন মা তার সন্তানকে কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে ভালোবাসেন। পবিত্র

কুরআন থেকে জানা যায়, খোদাপ্রেমী মানুষ উন্নতি করে এ ধরনের ভালোবাসা লাভ করতে পারে। চাইলে উন্নতির ক্রমধারায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এরূপ ভালোবাস সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য খাটো নয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় এসব বিষয় অর্জন হয়ে যায়, বরং এগুলো হলো উন্নত নৈতিকতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তিনি (আ.) বলেন, আমি তো বিশ্বাস করি, খোদাভক্তরা এতদূর উন্নতি করেন যে, মায়ের ভালোবাসার চাইতেও তারা মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসা হয়ে যায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আদল বা ন্যায়বিচারের অবস্থা সেরূপ যা মুত্তাকীর নফসে আম্মারা (তথা অবাধ্য আত্মায়) হয়ে থাকে। এ অবস্থার সংশোধনের জন্য ন্যায়বিচারের নির্দেশ রয়েছে। পাপপঙ্কিলতা থেকে বাইরে বের হওয়া, মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া– এটিও ন্যায়বিচারের অবস্থা। এ ক্ষেত্রে নফসকে (নিজের) বিরোধিতা করতে হয়। পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নফস বা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করাও আদল বা ন্যায়বিচারের একটি ধরন। যেমন, কারো ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টিকে নিন, নফস বা প্রবৃত্তি কোনোভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায় আর দৈবক্রমে যদি মেয়াদটাও পার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অবাধ্য প্রবৃত্তি আরো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে এবং ধৃষ্ট হয়ে যায় যে, এখন তো আইনগতভাবেও ধরা পড়া সম্ভব না। কিন্তু এটি ঠিক নয়। ন্যায়বিচারের দাবি হলো প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে দেয়া। অর্থাৎ অবশ্য পরিশোধযোগ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং কোনো কৌশল বা অজুহাতে এটি আত্মসাৎ করা যাবে না। কিছু লোক ঋণ আত্মসাৎ করতে বা সময়মতো পরিশোধ না করতে (চেষ্টা করে), কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলে কখনো কখানো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, পুরোপুরি অস্বীকার করে বসে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষ করছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে আমি এটিও বলে দিতে চাই যে, অনেক সময় লেনদেনে ঝগড়াবিবাদ শুরু হওয়ার কারণ হলো মানুষ অন্যের প্রতি অযৌক্তিক আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, যখনই লেনদেনের বিষয় আসবে তখনই তা লিখে নিবে। এমন নয় যে, আমার নিকট আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই আমি লিখব না। এ কারণেই বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলেই নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মা মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে।

যাহোক, একজন মু'মিনের দায়িত্ব হলো এসব বিষয় এড়িয়ে চলা এবং ন্যায়বিচার করা। তিনি (আ.) বলেন, আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, কিছু লোক এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয় না এবং আমাদের জামা'তেও এমন লোক আছে যারা তাদের ঋণ পরিশোধের প্রতি খুব কম মনোযোগী। এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কাজ। মহানবী (সা.) এমন লোকদের (জানাযার) নামায পড়তেন না। তাই তোমাদের প্রত্যেকেরই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নয়। সকল প্রকারের খেয়ানত ও বেঈমানী থেকে দূরে থাকা উচিত, কেননা এটি ঐশী নির্দেশ পরিপন্থী যা তিনি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আবার তিনি (আ.) বলেন, এরপর রয়েছে এহসান বা অনুগ্রহের স্তর। যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার করার বিষয়ে যত্নবান এবং এর সীমা অতিক্রম করে না, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শক্তিসামর্থ্য দান করেন আর সে পুণ্যকর্মে আরো উন্নতি করে। এমনকি সে কেবল ন্যায়বিচারই নয় বরং সে সামান্য পুণ্যের বিনিময়ে অনেক বড়ো পুণ্যকর্ম করে। কিন্তু এহসান

বা অনুগ্রহ করার পর্যায়ে একটি দুর্বলতা অবশিষ্ট রয়ে যায় আর তা হলো, কোনো না কোনো সময় সে সেই পুণ্যকর্মের খোঁটা দিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি দশ বছর যাবৎ কোনো ব্যক্তিকে আহার করায় আর সে যদি কোনো সময় তার কোনো একটি কথা না শোনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বলে বসে, দশ বছর ধরে তুমি আমার অনুগ্রহে চলেছো। আর এভাবে সে সেই পুণ্যকর্মকে বিনষ্ট করে বসে। মূলতঃ অনুগ্রহকারীর মাঝেও এক ধরনের সুপ্ত লোক দেখানো ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায় যা সকল প্রকার দুর্বলতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র আর তা হলো ঈতায়ি যিল-কুরবা-এর স্তর।

তিনি (আ.) বলেন, ঈতায়ি যিল-কুরবা-এর স্তর হলো একটি প্রকৃতিগত অবস্থার স্তর, অর্থাৎ যে পর্যায়ে মানুষের দ্বারা পুণ্যকর্মগুলো সেভাবে সংঘটিত হয় যেভাবে প্রকৃতিগত বা সহজাত দাবির ফলে হয়ে থাকে। মায়ের বাচ্চাকে দুধ পান করানো ও লালনপালনের বিষয়টিকে এর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। কখনো তার মনে এ চিন্তারও উদ্রেক হয় না যে, বড়ো হয়ে সে উপার্জন করবে এবং তার সেবাশুশ্রূষা করবে। এমনকি কোনো বাদশাহ যদি তাকে এ নির্দেশ দেয় যে, তুমি যদি তোমার বাচ্চাকে দুধ না দাও আর এর ফলে সে মারা যায় তাহলে তোমাকে কোনোভাবে পাকড়াও করা হবে না। এ নির্দেশের পরও সে তাকে দুধ পান করানো বাদ দিতে পারে না, বরং এমন বাদশাহকে সে দু-চারটি গালমন্দও শুনিয়ে দিবে, কেননা সেই লালনপালন তার একটি প্রকৃতিগত দাবি। এটি কোনো প্রত্যাশা কিংবা ভয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। একইভাবে মানুষ যখন উন্নতি করতে করতে এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে সেই পুণ্যকর্ম তার দ্বারা এমনভাবে সংঘটিত হয় যেন এটি একটি প্রকৃতিগত দাবি। অতএব এটিই সেই অবস্থা যাকে মুতমাইন্না বা পরিতৃপ্ত আত্মা বলা হয়।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মা নিজে কষ্ট সহ্য করে হলেও সন্তানকে আরামে রাখার চেষ্টা করে। নিজে ভেজা জায়গায় শোয় অথচ তাকে বিছানার শুকনো স্থানে জায়গা করে দেয়। বাচ্চা অসুস্থ হলে বিনিদ্র রাত কাটায় এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করে। এখন বলো! মা নিজের সন্তানের জন্য যা কিছু করে তার মাঝে কি কোনো কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতার কিছু পাওয়া যায়? এটি তো খাঁটি ভালোবাসার ফলেই হয়ে থাকে, আর এই ভালোবাসাই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অনুগ্রহের স্তর পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হও এবং ঈতায়ি যিল-কুরবা পর্যন্ত উন্নতি করো আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের প্রতি কোনো প্রতিদান, কিংবা সেবা লাভের চিন্তা না করে প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ স্পৃহা থেকে পুণ্যকর্ম করো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের সাথে তোমরা এমনভাবে পুণ্য করো যেন তাতে কোনো কৃত্রিমতা এবং লোকদেখানো ভাব না থাকে। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্ত এবং আধ্যাত্মিকতার পরম মার্গে উপনীত মানুষের রীতি হলো, তার পুণ্যকর্ম কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরেই হয়ে থাকে আর তার হৃদয়ে এ ধারণাও থাকে না যে, এই পুণ্যকর্মের ফলে তার জন্য দোয়া করা হবে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে। পুণ্যকর্ম কেবল সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করে থাকে যা মানবজাতির জন্য তার হৃদয়ে প্রোথিত রাখা হয়েছে। এমন পবিত্র শিক্ষা আমরা তওরাতেও দেখি নি এবং ইঞ্জিলেও না। আমরা এর একেকটি পৃষ্ঠা পড়েছি কিন্তু এমন পবিত্র ও পরিপূর্ণ শিক্ষার নামগন্ধও সেখানে নেই।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হলো, পুণ্যের বিপরীতে পুণ্য করো। কিন্তু যদি ন্যায়বিচারের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে কোনো অনুগ্রহ বা এহসান করার সুযোগ

হয় তবে সেখানে অনুগ্রহ করো। আর যদি অনুগ্রহের চেয়ে এগিয়ে স্বজনদের ন্যায় স্বভাবজ আবেগে পুণ্য করার সুযোগ পাও তবে সেখানে স্বভাবজ ভালোবাসার টানে পুণ্য করো। আর খোদা তা'লা এথেকে বারণ করেন যে, তোমরা ভারসাম্য হারিয়ে বসবে। ভারসাম্য সর্বাবস্থায় বজায় রাখতে হবে। (খোদা তা'লা এথেকে বারণ করেন যে,) অনুগ্রহের ক্ষেত্রে অপছন্দনীয় অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যা বিবেকবুদ্ধির পরিপন্থী, অর্থাৎ তোমরা অপাত্রে অনুগ্রহ করবে কিংবা যথাস্থানে অনুগ্রহ করতে দ্বিধা করবে। বিবেক ও ন্যায়বিচারের দাবিও সামনে রাখতে হবে যেন অনুগ্রহ অপাত্রে না করা হয়, আবার যে স্থানে অনুগ্রহ করা আবশ্যক সেখানেও যেন অনুগ্রহ করতে অস্বীকৃতি না জানানো হয়। মোটকথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, বিবেকবুদ্ধি কী বলে এবং কল্যাণ কিসে নিহিত? (খোদা তা'লা এথেকেও বারণ করেন যে,) তোমরা যথাস্থানে ঈতায়ি যিল-কুরবা তথা আত্মীয়সুলভ আচরণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করবে অথবা সীমাতিরিক্ত দয়ামায়া প্রদর্শন করবে। এ আয়াতে পুণ্য অর্জনের তিনটি স্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব যেখানে এ পুণ্য করার নির্দেশ রয়েছে সেখানে বিবেক খাটানোর, ন্যায়বিচার করার ও সৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নির্দেশ হলো, সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য নয় বরং তোমাদের সব পুণ্য যেন কল্যাণ সাধনের কারণ হয়। মা তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসা সত্ত্বেও কখনোই তার দাবির মুখে তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে দেয় না। অতএব মূল উদ্দেশ্য হলো মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন আর এর জন্য এ তিনটি পুণ্য সম্পাদন করতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রথম পর্যায় হলো পুণ্যের বদলে পুণ্য করা। যারা পুণ্য করে তাদের সাথে পুণ্য করা। এটি তো নিম্ন পর্যায় আর নিম্ন স্তরের কোনো ভদ্র লোকও করতে পারে। অর্থাৎ কোনো ভদ্র মানুষের সদাচার করা– এটি একটি মৌলিক বিষয়। এটি কোনো উচ্চাঙ্গের পুণ্য নয় বরং সাধারণ ভদ্রতা। দ্বিতীয় পর্যায়টি এরচেয়ে কঠিন আর সেটি হলো সূচনাস্বরূপ নিজের পক্ষ থেকে পুণ্য করা এবং কারো অধিকার ছাড়াই অনুগ্রহস্বরূপ তার কল্যাণ সাধন করা। আর এটি হলো মধ্যম পর্যায়ের চারিত্রিক গুণ। পুণ্য করা এবং কারো অধিকার ছাড়াই তার প্রতি অনুগ্রহ করা, তার উপকার করা আর এটিও মধ্যম পর্যায়ের নৈতিক গুণ। বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহ করে, কিন্তু অনুগ্রহের ভেতর একটি সুপ্ত ব্যাধি থাকে। তা হলো অনুগ্রহকারী মনে করে, 'আমি অনুগ্রহ করেছি' আর সে কমপক্ষে নিজের অনুগ্রহের বিপরীতে কৃতজ্ঞতা বা দোয়া প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি তার বিরোধী হয়ে যায় তাহলে তাকে অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেয়। কেউ কেউ তো নিজ অনুগ্রহের কারণে তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়। যেহেতু আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং এতটা সময় তোমার কাজে লেগেছি বা আমার কাছ থেকে তুমি উপকৃত হয়েছো, একারণে অনুগ্রহকারী তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় আর তাকে তার অনুগ্রহের খোঁটা দেয়। যেমন অনুগ্রহকারীকে খোদা তা'লা সতর্ক করতে বলেন, لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারীরা! তোমার নিজেদের সদকাকে যার ভিত্তি আন্তরিকতার ওপর হওয়ার কথা, অনুগ্রহের খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সতর্ক করে বলেছেন, এরূপ অনুগ্রহ করা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তোমরা যে সদকা করছো তার ভিত্তি সততা ও নিষ্ঠার ওপর হওয়ার কথা। কাজেই যদি অনুগ্রহের খোঁটা দাও তবে তোমাদের সব পুণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ সদকা শব্দটি সিদ্‌ক থেকে উদ্ভূত। অতএব হৃদয়ে সততা ও নিষ্ঠা না থাকলে সেই সদকা সদকা থাকে না, বরং এটি

লোকদেখানো কর্ম হয়ে যায়। মোটকথা অনুগ্রহকারীর মধ্যে এই ত্রুটি থাকে যে, কখনো রাগান্বিত হয়ে নিজের অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ে দেয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীদের সতর্ক করেছেন। খোদা তা'লা কল্যাণ সাধনের তৃতীয় যে স্তরের কথা বলেছেন তা হলো, অনুগ্রহ যে করেছো সেকথা যেন মাথায় না আসে আর কৃতজ্ঞতার প্রতিও যেন দৃষ্টি না থাকে, বরং এমন এক সহানুভূতির প্রেরণায় পুণ্য সম্পাদিত হওয়া উচিত যেমনটি কোনো একান্ত নিকটাত্মীয় করে থাকে। যেমন এক মা কেবল মমতার প্রেরণায় আপন সন্তানের উপকার সাধন করে থাকে। এটি কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত স্তর; এরচেয়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু খোদা তা'লা কল্যাণ সাধনের এসব ধরনকে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আর উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, এসব কল্যাণ সাধন বা পুণ্য যদি নিজ নিজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হয় তাহলে এগুলো মন্দকর্ম হয়ে যাবে। এটিও একটি সাবধানবাণী, পুণ্যকর্ম যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে না হয়, যথাযথভাবে না হয়, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে– তাহলে পুণ্য নয় বরং পাপে পর্যবসিত হবে। ন্যায়বিচার হওয়ার পরিবর্তে অশ্লীলতায় পরিণত হবে। মন্দ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করার পরবর্তী যে ধাপ রয়েছে তারও কিছুটা উল্লেখ এখানে এসে যায়, অর্থাৎ আদল বা ন্যায়বিচার অশ্লীল বা অপকর্মে পরিণত হবে। অর্থাৎ এতটাও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যার ফলে তা অপবিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। আর একইভাবে এহসান বা অনুগ্রহের পরিবর্তে তা অপছন্দনীয় বিষয়ের রূপ নেবে। তখন এটি আর অনুগ্রহ হবে না বরং এটি মুনকার বা মন্দকর্ম হয়ে যাবে। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যাকে বিবেক ও জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করে এবং সেটি তখন ঈতায়ি যিল-কুরবা তথা নিকটাত্মীয়সুলভ কল্যাণ গণ্য না হয়ে বাগী তথা বিদ্রোহ হয়ে যায়। অর্থাৎ অস্থানে সহানুভূতির আবেগ একটি কুৎসিত চিত্র সামনে নিয়ে আসবে। আসলে বাগী সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যা মাত্রারিক্ত বর্ষিত হয় এবং ফসলাদি ধ্বংস করে দেয়। আবশ্যকীয় অধিকার প্রদানে যদি ঘাটতি থেকে যায় সেটিকে বাগী বলে, আবার অতিরিক্ত প্রদান করাকেও বাগী বলে। বস্তুতঃ এই তিনটির মধ্য থেকে যেটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না সেটিই কুৎসিত রূপ ধারণ করবে। তাই এই তিনটির সাথেই স্থান-কাল-পাত্রকে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ স্থলে মনে রাখতে হবে, নিছক আদল বা এহসান বা নিকট আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতিকে নৈতিক চরিত্র বলা যায় না, বরং মানুষের মাঝে এগুলো সবই স্বভাবজ অবস্থা এবং স্বভাবজ শক্তিবৃত্তি, এগুলো বাচ্চাদের মাঝে বোধ সৃষ্টিরও পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু চারিত্রক গুণের জন্য বিবেক ও বোধ পূর্বশর্ত। অধিকন্তু এ শর্তও রয়েছে যে, প্রতিটি স্বভাবজ গুণ বা বৈশিষ্ট্য স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। এরপর এহসান বা অনুগ্রহের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষামালা রয়েছে আর সবগুলো আলিফ-লাম দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে যা কোন জিনিসকে বিশেষ বা নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনটি করে স্থান-কাল-পাত্রের উপযুক্ততার শর্তের প্রতি নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ এসব সদগুণ বা নৈতিক গুণাবলীকে বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে অর্থাৎ বলে দেয়া হয়েছে, এই এই নৈতিক গুণ অমুক অমুক জিনিসের জন্য নির্ধারিত।

অতএব, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এসব পুণ্য সম্পাদন করার জন্য তিনি আমাদেরকে নসীহত করেছেন। পুণ্য করা প্রসঙ্গে অর্থাৎ অনুগ্রহ করা প্রসঙ্গে তিনি নিজের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

এহসান বা অনুগ্রহ একটি অতি উন্নত গুণ। এর মাধ্যমে মানুষ বড় বড় বিরুদ্ধবাদীকেও বশীভূত করে। যেমন, শিয়ালকোটে এক ব্যক্তি ছিল যে সবার সাথে ঝগড়া রাখতো আর এমন কেউ ছিল না যার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এমনকি তার ভাই, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনরাও তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সাথে আমি কোনো কোনো সময় সামান্য ভাল ব্যবহার করেছি আর এর বিনিময়ে কখনো সে আমার সাথে মন্দ আচরণ করে নি, বরং যখনই আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো খুবই শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতো। তেমনিভাবে এক আরব ব্যক্তি আমাদের কাছে আসে আর সে ওয়াহাবীদের ঘোর বিরোধী ছিল, এমনকি তার সামনে ওয়াহাবীদের নাম নিলেও গালিগালাজ শুরু করে দিত। এই ব্যক্তি এখানে এসেও নোংরা গালিগালাজ দেয়া আরম্ভ করে এবং ওয়াহাবীদের গালমন্দ করতে থাকে। আমি এসবের কোনো পরোয়া না করে তার সর্বাত্মক সেবা করেছি এবং যথাযথাভাবে তাকে দাওয়াত খাইয়েছি। একদিন সে যখন রাগের আতিশয্যে ওয়াহাবীদেরকে চরম গালিগালাজ করছিল তখন কেউ একজন তাকে বলে, 'যার ঘরে তুমি আতিথ্য গ্রহণ করেছ তিনিও তো ওয়াহাবী।' সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। একথা শুনে সে চুপ হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি বলেছিল, 'তিনি ওয়াহাবী'– সেই ব্যক্তির আমাকে ওয়াহাবী বলা ভুল ছিল না। কেননা আমি পবিত্র কুরআনের পরে সহীহ হাদীসসমূহের ওপর আমল করা জরুরি বলে মনে করি। যাহোক, কিছুদিন পর সে ব্যক্তি চলে যায়। এরপর একবার লাহোরে আমার সাথে আবার দেখা হয়। যদিওবা সে ওয়াহাবীদের চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না, কিন্তু যেহেতু তাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছিল এজন্য তার সমস্ত উত্তেজনা ও ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে যায়। আর সে আমার সাথে পরম সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করে। অনেকবার অনুরোধ করে আমাকে তার সাথে একটি ছোট মসজিদে নিয়ে যায় যে মসজিদের সে ইমাম ছিল। সেখানে নিয়ে আমাকে বসায় এবং এক ভৃত্যের ন্যায় বাতাস করতে থাকে। অনেক জোর দিয়ে বলে যে, চা ইত্যাদি কিছু পান করে যাবেন। অতএব, দেখো, অনুগ্রহ কীভাবে মানুষের হৃদয়কে জয় করে।"

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি হলো তা যা বর্তমান যুগের নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা উপস্থাপন করে; সাক্ষাতে বাহ্যত তোষামোদী ও চাটুকারিতা প্রদর্শন করে। তোষামোদ অর্থ জি হুযূর, জি হুযূর করে কিন্তু হৃদয় কপটতা এবং বিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকে। এমন চরিত্র পবিত্র কুরআনবিরোধী। দ্বিতীয় প্রকারের চরিত্র হলো সত্যিকার সহানুভূতি লালন করবে, হৃদয়ে যেন কপটতা না থাকে এবং তোষামোদী ও চাটুকারিতার আশ্রয় যেন না নেয়। যেমন, খোদাতা'লা বলেন, إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ। এটি হলো উৎকর্ষ পদ্ধতি বা রীতি। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট রীতি ও হেদায়াত খোদার কালামে বিদ্যমান রয়েছে। যে এটি থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে বা বিমুখ হবে সে অন্যত্র হেদায়াত পেতে পারে না। উত্তম শিক্ষা আপন প্রভাব বিস্তারের জন্য হৃদয়ের পবিত্রতা চায়। যারা এ থেকে রিক্তহস্ত তাদেরকে যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখো তাহলে তাদের মাঝে অবশ্যই নোংরামি দেখতে পাবে। জীবনের কোন ভরসা নেই। নামায, সততা ও পবিত্রতায় উন্নতি করো।" তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, নামায, সততা ও নিষ্ঠা এবং পবিত্রতায় উন্নতি করো; ইবাদত, সততা এবং পবিত্রতায় উন্নতি করো।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে বারবার এ উপদেশই দিই যে, তোমরা কখনোই নিজ সহানুভূতির গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করো না। সহানুভূতির জন্য সেই শিক্ষার অনুসরণ করো যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। অর্থাৎ, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমত তোমরা আদল বা ন্যায়বিচারকে দৃষ্টিপটে রাখ। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে পুণ্য করে তোমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করো, পুণ্য করো। এরপর দ্বিতীয় স্থর হলো তোমরা এর চেয়েও উন্নত মার্গের আচরণ করো; এটি হলো এহসান। এহসানের স্তর বা পর্যায় আদল বা ন্যায়বিচারের চেয়ে উন্নত স্তর আর এটি অনেক বড় পুণ্য। কিন্তু অনুগ্রহকারী কখনো কখনো খোঁটা দিয়ে বসতে পারে। কিন্তু এসবের চেয়েও উন্নত একটি স্তর রয়েছে অর্থাৎ মানুষ এমনভাবে পুণ্য করবে যা ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় হয়ে থাকে। যাতে অনুগ্রহ দেখানোর কোন বিষয় অন্তর্হিত থাকে না। যেমন মা নিজ সন্তানের লালনপালন করে থাকে। সে এই লালনপালনে কোন পুরস্কার ও সেবার প্রত্যাশী হয় না। বরং এক প্রকৃতিগত আবেগ থাকে যার কারণে শিশুর জন্য নিজের সমস্ত সুখ এবং আরামকে বিসর্জন দেয়। যদি বাদশাহও তাকে বলে, তুমি এ বাচ্চাকে দুধ পান করাবে না, তাহলে সে বাদশাহকে গালমন্দ করবে। সুতরাং এমনভাবে পুণ্য করতে হবে যেন তা স্বভাবজ গুণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়। কেননা কোনো জিনিস যখন উন্নতি করতে করতে সহজাত উৎকর্ষতায় পৌঁছে যায় তখন সেটি পূর্ণতা পায়।"

তিনি (আ.) বলেন, "খোদা আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা গোটা পৃথিবীর সাথে ন্যায়বিচার করো। অর্থাৎ, যতটুকু অধিকার প্রাপ্য ততটুকুই নাও এবং মানবজাতির সাথে ন্যায়পূর্ণ আচরণ করো। এরচেয়ে বড় নির্দেশনা হলো, তোমরা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহের আচরণ করো। অর্থাৎ সে আচরণ প্রদর্শন করো যে আচরণ করা তোমার জন্য আবশ্যক নয়, যা কেবল মানবতা প্রদর্শনমূলক। কিন্তু যেহেতু অনুগ্রহের মাঝেও একটি সুপ্ত ব্যাধি রয়েছে যে, অনুগ্রহকারীও কখনো কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে অনুগ্রহের খোঁটা দিয়ে বসে, এজন্য এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– পরিপূর্ণ নেকী হলো, তোমরা মানবজাতির প্রতি সেভাবে পুণ্য কাজ করো যেভাবে মা তার সন্তানের প্রতি পুণ্য করে থাকে। কেননা সে পুণ্যকাজ শুধুমাত্র স্বভাবজ প্রেরণায় হয়ে থাকে আর কোন প্রতিদানের লোভে নয়। তার হৃদয়ে এ ধারণাই থাকে না যে, এ সন্তান এই সেবার বিনিময়ে আমাকেও কোনো কিছু প্রদান করবে। সুতরাং সেই কল্যাণ সাধন যা মানবজাতির প্রতি করা হয় তার এই স্তর হচ্ছে তৃতীয় স্তর যাকে **ঈতায়ি যিল-কুরবা** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং পুণ্যকাজ শুধুমাত্র আপনজনদের সাথে নয় বরং সবার সাথেই করা উচিত। আর কোনো প্রতিদানের আশাবাদী না হয়ে পুণ্য করার নির্দেশ রয়েছে। আর এটিই সে পদমর্যাদা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়া যায় যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ পুস্তকাবলী ও বৈঠকে এ বিষয়ে অসংখ্যবার তাগাদা দিয়েছেন। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষায় নেই। তাই আমাদের কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের প্রকৃত মান অর্জনের জন্য আর বান্দার অধিকার আদায়ের জন্যও ইসলামী শিক্ষানুসারে কাজ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইসলামী শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। ইবাদতের উন্নত মানে আমাদেরকে উপনীত হওয়ার তৌফিক দিন। আমরা যেন বান্দার অধিকার আদায়কারী হতে

পারি। বিশেষত পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক যেন এমন হয় যা পৃথিবীবাসীর জন্য এক দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সকল কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বয়াতের কারণে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য প্রদান করুন। তাঁর বয়াতের শর্তাবলীর মাঝেও মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার শর্ত রয়েছে। প্রতিটি জুমুআয় আল্লাহ্ তা'লার এ সকল শব্দাবলীকে শোনা, পুণ্যকাজে অগ্রগামী হওয়া ও আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার যেন কারণ হয়। নতুবা আমাদের ও অন্যদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও অন্যদের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করুন যেভাবে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে তা উল্লেখ করেছেন।

পাকিস্তানের অবস্থার জন্যও দোয়া অব্যাহত রাখুন। আমাদেরকে তো পুণ্য ছড়ানোর জন্য নিজ কাজ চলমান রাখতে হবে। আর শয়তান স্বভাববিশিষ্টরা অন্যায় করে যাবে যা হলো তাদের কাজ। এসব শয়তানির ক্ষেত্রে এদের সাথে আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। আমাদের কাজ হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী চলতে পারি। সর্বদা এ দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের ঈমানের সুরক্ষা করেন আর কখনো আমাদের ঈমান যেন দোদুল্যমান না হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক যা **ঈতায়ি যিল-কুরবা**'র স্তরে লাভ হয়। তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির দৃশ্যাবলীও পূর্বের চেয়ে অধিক হারে দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যারা শত্রু ও সংশোধনের অযোগ্য তাদের তিনি স্বয়ং ধ্বংস করুন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের যখন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে তখন শত্রুদের ধ্বংস হবার দৃশ্যও আমরা প্রত্যক্ষ করবো।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)